ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

সড়ক দুর্ঘটনা ও পুলিশী ভাবনা

সনতোষ বড়ুয়া

সারদা পুলিশ একাডেমিতে এক বছরের প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষানবিশ এসআই হিসেবে আমি প্রথম যোগদান করি মৌলভীবাজার জেলায়। আইন-কানুনসহ নানা জাতের প্রশিক্ষণ একাডেমিতে সম্পন্ন করে এলেও এ বিষয়ে বাস্তব কোন ধারণা তখনও ছিল না। চাকরিতে যোগদানের কয়েক দিনের মধ্যেই সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে এক বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ হল। সরকার বাজারের কাছের স্কুলের নাম সম্ভবত আজমনি হাই স্কুল। সেই স্কুলের একজন ছাত্র রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় আহত কি নিহত হওয়ায় স্কুলের ছাত্ররা ঢাকা-সিলেট সড়ক অবরোধ করে রাখে। সেই অবরোধ সরানোর জন্য এসআই ইসহাক মিয়াকে প্রয়োজনীয়সংখ্যক পুলিশসহ ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা হয়; এ বিষয়ে বাস্তব ধারণা নেয়ার জন্য আমিও সাথে যাই।

আমরা সেখানে পৌঁছার সাথে সাথেই এসআই ইসহাক মিয়া পুলিশের ভ্যান থেকে নেমে ছাত্রদের দেয়া ইট- পাথরের ব্যারিকেড পা দিয়ে সরাতে থাকেন। তাঁর সাথে অন্যান্য পুলিশ সদস্যও যোগ দেয়। ব্যারিকেড সরানোর আগে অফিসার বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সাথে কোন প্রকার কথাই বলেননি। এতে ছাত্ররা খেপে যায় এবং পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এমতাবস্থায় আমরা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কক্ষে আশ্রয় নেই। এরপর এএসপি (সদর) আরও পুলিশ সদস্যসহ ঘটনাস্থলে এসে ছাত্রদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে ব্যারিকেড প্রত্যাহার হলে আমরাসহ থানায় ফিরে আসি।

সন্ধ্যায় এএসপি সাহেব আমাদের ব্রিফ করছিলেন যে ভুল আমাদেরই হয়েছে। কারণ ঘটনাস্থলে পৌঁছার পর প্রথম পুলিশ দলের অফিসারের দায়িত্ব ছিল ছাত্রদের সাথে ঘটনার বিষয়ে আলাপ করে, উপযুক্ত বিচারের আশ্বাস দিয়ে ছাত্রদের শান্ত করে তাদের মাধ্যমে ব্যারিকেড প্রত্যাহার করা। কিন্তু পুলিশ অফিসার সেটা না করে, ছাত্রদের মনের অবস্থা বিবেচনা না করে জোরপূর্বক ব্যারিকেড সরানোর চেষ্টা করাতেই ছাত্ররা খেপেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

বুঝতে পেরেছিলাম, কোন স্কুল-কলেজের সামনে যদি কোন সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে, বা কোন গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়া রাস্তায় কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে পুলিশের উচিত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের মানসিক অবস্থা বিবেচনায় এনে ব্যবস্থা নেয়া। দ্রুত ত্রুটিবিহীনভাবে আইনি ব্যবস্থা সম্পন্ন করে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের মানসিক অবস্থা বিবেচনায় এনে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া। সে সময় পুলিশি কার্যক্রমে গাফিলতি দেখলে সাধারণ মানুষ অবশ্যই পুলিশের ওপর খেপে যেতে পারে।

দ্বিতীয় ঘটনা

অপর যে সড়ক দুর্ঘটনা এখনও মনে দাগ কেটে আছে সেটা হল শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জ সড়কে। ১৯৯২ সালে তখন আমি কমলগঞ্জ থানায় সেকেন্ড অফিসার। দুপুর বারোটা কি একটার দিকে একটি মিনিট্রাক শ্রীমঙ্গল থেকে কমলগঞ্জ আসার পথে লাউয়াছড়া রিজার্ভ ফরেস্টের কাছাকাছি কমলগঞ্জ এলাকায় উল্টে গিয়ে রাস্তার পাশে ছড়ায় পানিতে পড়ে যায়। সেই ট্রাকে মালামালের ওপরে কয়েকজন যাত্রী ছিল। তাদের মধ্যে চারজনই ট্রাকের চাপায় পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়। আমি যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করতে থাকি, মৃতদেহগুলো তখনও শক্ত হয়নি। মনে হচ্ছিল, ঘুমন্ত কোন মানুষ আমাদের নাড়াচাড়াতেও জাগতে পারছে না কোন না কোন কারণে। কোন মৃতদেহের শরীরে তেমন কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না, কারণ ট্রাকের চাপায় ছড়ার পানির নিচেই তাদের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল মূলত নতুন তৈরি সরু পাকা রাস্তায় অধিক পরিমাণ মালামাল লোড নিয়ে বাঁক ঘোরার কারণে। যদি ট্রাকের মালামালের ওপর কোন যাত্রী না থাকত তাহলে কোন প্রাণহানিই ঘটত না। বাংলাদেশের মোটরযান আইনেই বলা আছে, পণ্যবাহী ট্রাকে যাত্রী পরিবহন করা যাবে না। কিন্তু যাত্রী পরিবহন করে ট্রাকের চালক অন্যায় করেছে। তা ছাড়া ট্রাকে অধিক পরিমাণ পণ্য বোঝাই থাকায় মোড় ঘোরার সময় সেটি উল্টে খাদে পড়ে যায়।

তৃতীয় ঘটনা

আরও একটি সড়ক দুর্ঘটনা এত দিন পরেও ভুলতে পারিনি। ১৯৯৭ কি ৯৮ সাল। তখন আমি বান্দরবানের লামা থানায় কর্মরত ছিলাম। কোন এক দুপুরবেলা খেতে বসেছি। তখন সংবাদ পেলাম, থানার সামনের রাস্তায় বাস দুর্ঘটনায় একজন লোক গুরুতর আহত হয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি আহত ব্যক্তি রাস্তার পাশে পড়ে আছে। আঘাত গুরুতর। তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে বাসটি জব্দ করা হয়। চালক পালিয়ে গেছে ঘটনার সাথে সাথেই। ঘটনা ঘটেছিল এ রকম : লামা থেকে যে মিনিবাস চকরিয়া যাচ্ছিল, সেই বাসের ছাদে করে গাছের বলী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আহত লোকটি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। বাসটি যখন তাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, তখন বাসের ছাদে থাকা একটি গাছের বলী সাইকেলযাত্রীর মাথায় পড়ে, ফলে সে গুরুতর আহত হয়। এই দুর্ঘটনার জন্যও বাসের চালক দায়ী, কারণ বাসের ছাদে অর্থাৎ যাত্রীবাহী পরিবহনের ছাদে মালামাল পরিবহন নিষিদ্ধ হলেও বাসচালক বলীর মত বিপজ্জনক মালামাল পরিবহন করছিল।

কিন্তু সেই দুর্ঘটনায় যে বিষয়টি আমার মনে পীড়া দেয় এবং এখন মনে বিঁধে আছে সেটা হল, সেই আহত ব্যক্তির ঘটনার সাথে সাথে মারা না যাওয়া। মারা গেলে সে বেঁচেই যেত। কিন্তু শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকা পুরো পরিবারের জন্যই ছিল কষ্টকর। একজন চালকের অসতর্কতার কারণে একটি পরিবারকে পথে বসে যেতে দেখেছি আমি। গাড়ির মালিক হাসপাতালে চিকিৎসার সময় এক-আধটু খবরাখবর নিলেও পরে আর কোন খোঁজ রাখেনি।

চতুর্থ ঘটনা

২০০৯ সালে আমি তখন ফেনী জেলার দাগনভূঞা থানায় কর্মরত। একদিন সন্ধ্যায় একটি মোটরসাইকেলে তিনজন যুবক ফেনী থেকে দাগনভূঞার দিকে আসছিল। মোটরসাইকেল চালক একটা বাসকে সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে বড় রেইনট্রি গাছের সাথে ধাক্কা খায়। তিনজনই মারা গিয়েছিল মাথায় আঘাতজনিত কারণে। যদি তাদের মাথায় হেলমেট থাকত তাহলে মনে হয় তারা

আহত হলেও মারা যেত না।

এ ধরনের অনেক সড়ক দুর্ঘটনার কেস হিস্ট্রি মনে আছে, কিন্তু সব উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যেসব দুর্বল ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো হল–

১। দ্রুত ও বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো
২। ট্রাকে-বাসে অতিরিক্ত মালামাল ও যাত্রী বোঝাই করা
৩। ত্রুটিযুক্ত গাড়ি চালানো
৪। লাইসেন্সবিহীন অদক্ষ চালকের গাড়ি চালনা
৫। সড়কের জন্য নির্ধারিত গতিসীমা না মানা
৬। সড়ক নির্মাণের ত্রুটি, যা কখনই স্বীকার কারা হয় না।

এখানে উল্লিখিত ৬ নম্বর কারণ ব্যতীত অন্য সব অপরাধ পুলিশ দমন করতে পারে। কিন্তু সড়কের ত্রুটি ঠিক করা পুলিশের কাজ নয়। উন্নত বিশ্বে সড়কের ত্রুটির কারণে যদি কোন স্থানে বার বার দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে সড়কের সেই স্থান নতুন প্যাটার্নে তৈরি করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এ বিষয়ে তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না।

এবার পুলিশের ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে আসি। কেন ট্রাফিক পুলিশ কঠোরভাবে ব্যবস্থা নিতে পারে না? নিতে পারে না বিবিধ কারণে–যার প্রথম কারণ হল ঘুষ বাণিজ্য। দ্রুত গতিতে গাড়ি চালনার জন্য গাড়ির স্পিড রেকর্ড করার মত ডিভাইস মনে হয় বাংলাদেশ পুলিশের নেই, যেটা বিদেশে পুলিশ অহরহ ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু ২ থেকে ৫ নম্বর অপরাধসমূহ পুলিশ কঠোর হলেই দমন করতে পারে। কঠোর না হতে পারার কারণ শুধু ঘুষ বাণিজ্য নয়। কোন জেলার বা উপজেলার ট্রাফিক পুলিশ যানবাহনের বিষয়ে একটু কঠোর হলেই তারা স্থানীয় নেতা, পাতিনেতার রোষানলে পড়ে, স্থানীয় নেতার তদবির না শুনলে তারা স্থানীয় এমপি বা মন্ত্রী পর্যন্ত যায়। আমি চাকরি করাকালে এমপি/মন্ত্রীর ফোনও পেয়েছি গাড়ির বিরুদ্ধে মামলা না দেয়ার জন্য। এমপি সাহেব এমনও বলেছেন, যানবাহন বাদ দিয়ে যেন অন্য বিষয়ে নজর দেই। এখানে উল্লেখ্য, ট্রাফিক পুলিশ অফিসার যানবাহন বিষয়ে মামলা ছাড়া অন্য কোন মামলা করতে পারে না, কিন্তু থানার পুলিশ যানবাহনসহ সকল ধরনের মামলাই করতে পারে।

দীর্ঘদিন পুলিশে মাঠপর্যায়ে চাকরি করে আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয়েছে তা হল, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়, প্রয়োজন শুধু গাড়ির চালক, ট্রাফিক পুলিশ আর সড়ক নির্মাণ বিভাগের সচেতনতা।

এই সচেতনতায় যেন মন্ত্রী/এমপিদের হস্তক্ষেপ না থাকে। আমাদের দেশের মন্ত্রী/এমপিরা দেশের সব বিষয়ে নাক গলাতে পটু। এ বিষয়ে একটু কম পটু হলেই হয়ে যায়। আর এই সচেতন ও আন্তরিক হওয়ার জন্য প্রয়োজন একটু ত্যাগ। ত্যাগ হল ট্রাফিক পুলিশকে ঘুষ বা মাসোয়ারা আদায় একটু কমাতে হবে, এ বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশের ওপরের সারির অফিসার, যাঁরা ট্রাফিক পুলিশের পোস্টিং করে থাকেন, তাঁরা মাসোয়ারার পরিমাণ একটু কমাবেন, চালক-মালিক পক্ষ রাজনীতির দাপট দেখানোর চেষ্টা না করে একটু আইন-কানুন মানার চেষ্টা করবে, আর সড়ক তৈরির সময় সড়ক বিভাগের প্রকৌশলীরা চেষ্টা করবেন, সড়কে যাতে এমন কোন ত্রুটি না থাকে, যা দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।

কিন্তু এসবের কিছুই সহজে সম্ভব বলে মনে হয় না। কারণ একটাই–আমরা একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে অভ্যস্ত, কিন্তু নিজের দোষ দেখি না। পুলিশ নিজের দোষ দেখে না, নেতারা তাদের দোষ দেখে না, গাড়ির চালক-মালিক নিজেদের দোষ দেখে না, সড়ক বিভাগ নিজেদের দোষ দেখে না। দেশে একটা কিছু ঘটে গেলে কিছুদিন শোরগোল চলে, এই করো সেই করো মতামত চলে, কিন্তু কয়েক দিন পরই যে লাউ সেই কদু। কারণ কী? কারণ একটাই–আমরা নীতির কথা বলি, নীতি মানি না। অন্যকে আইন-নীতি মানাতে চেষ্টা করি, কিন্তু নিজে মানি না।

সনতোষ বড়ুয়া: কবি ও ছড়াকার। সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা।
ই-মেইল : sbarua63@gmail.com

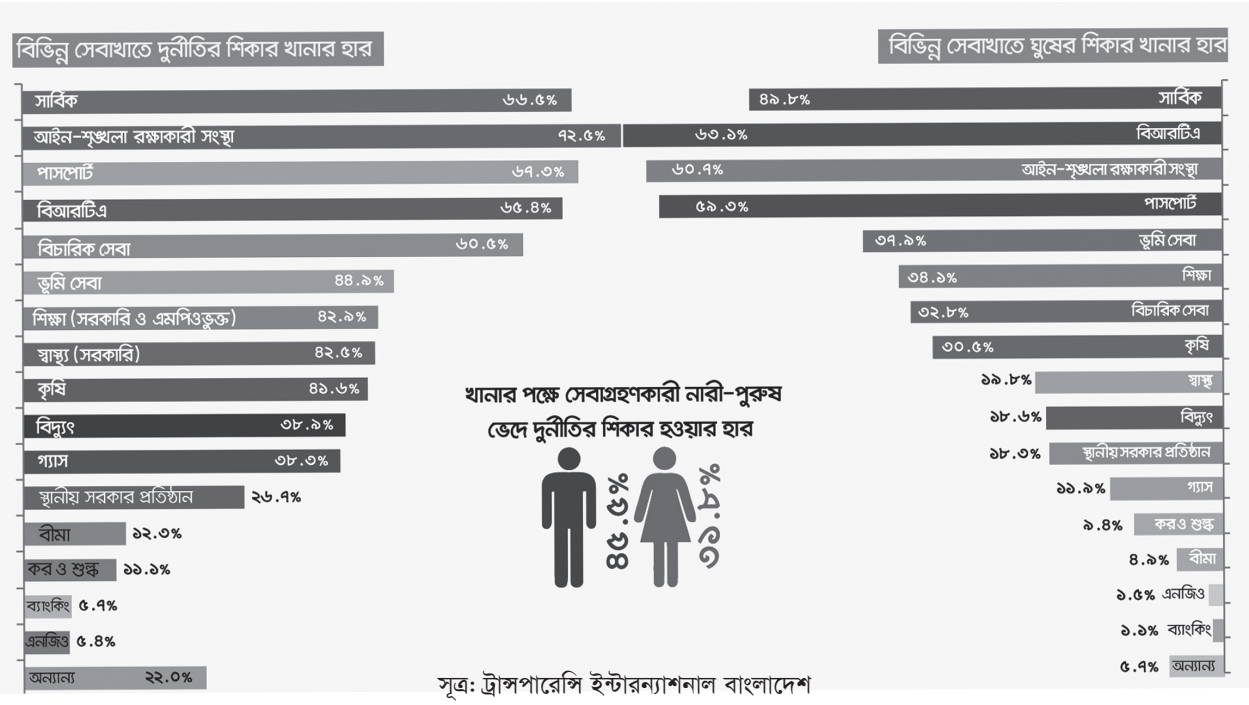

সূত্র: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ